ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম ফকির (সুফি) ও হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের সম্মিলিত সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন। ১৭৬০ সালে এ আন্দোলন শুরু হয় এবং চার দশকেরও অধিককাল তা অব্যাহত থাকে। ফকির ও সন্ন্যাসীদের এই অব্যাহত প্রতিরোধের কারণ প্রকৃতই দুর্বোধ্য। সম্ভবত কোম্পানি প্রবর্তিত রেগুলেশন দ্বারা মুসলিম ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা বিভিন্নভাবে ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হয় এবং এরই ফলে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোল‍ে। ফকির ও সন্ন্যাসীরা প্রধানত গ্রামাঞ্চলে তাদের অনুসারী ও সহমর্মী জনগণের নিকট থেকে দান গ্রহণ করে তার উপর ভিত্তি করেই জীবনধারণ করতেন। কোম্পানি শাসকরা দেশের ধর্মীয় রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে মোট‍েও অবগত ছিল না; আর সে কারণেই ফকির-সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণকে তারা জনসাধারণের নিকট থেকে অননুমোদিত অর্থ আদায় বলে মনে করত। কাজেই কোম্পানি ফকির-সন্ন্যাসীদের সংগঠিত দল কর্তৃক দান গ্রহণের উপর নিষেধ‍াজ্ঞা জারি করে। ফলে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। এই প্রতিরোধ আন্দোলন দেশের কৃষকশ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে। কারণ তারাও কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ভূমি রাজস্ব নীতির অধীনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আন্দোলনকারী ফকির-সন্ন্যাসীগণ ছিলেন মাদারিয়া সুফি তরিকার অনুসারী। এই সুফি তরিকা সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শাহ সুলতান সুরীয়া বুরহানার নেতৃত্বে বাংলায় প্রসার লাভ করে। সন্ন্যাসীগণ ছিলেন বেদান্তীয় হিন্দু যোগী এবং একদন্ডী সন্ন্যাসবাদের গিরি ও পুরী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ফকির ও সন্ন্যাসীগণ যথাক্রমে খানকাহ ও আখড়ায় বাস করতেন। সুফি ফকির ও যোগী সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও ধর্মাচরণে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। এই সাদৃশ্য ও একাত্মতা কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে সহায়ক হয়েছিল।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সংগঠক ও নেতা ছিলেন মাদারিয়া তরিকার সুফিসাধক মজনু শাহ। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বিহার ভিত্তিক মাদারিয়া সুফি তরিকার নেতা হিসেবে শাহ সুলতান হাসান সুরীয়া বুরহানার স্থলাভিষিক্ত হন। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দানে তাঁর খলিফা ছিলেন সুফিসাধক মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, পরাগল শাহ, সোবহান শাহ, করিম শাহ প্রমুখ। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে সম্পৃক্ত জনৈক ভোজপুরী ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠক তখন মজনু শাহর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জমিদার দেবী চৌধুরানীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন বলেও ধারণা করা হয়।

সমর সাজে ফকির মজনু শাহ

১৭৬০ সালে বিচ্ছিন্নভাবে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৭৬৩ সালে বিদ্রোহ পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং জোরদার হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল কোম্পানির কুঠি, ইংরেজ শাসকের অনুগত জমিদারদের কাচারি এবং জমিদারি আমলাদের আবাসস্থল। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে তরবারি, বর্শা, বল্লম, বন্দুক, অগ্নি নিক্ষেপক যন্ত্র, হাওয়াই ও ঘুর্ণায়মান কামান ব্যবহার করত।

ফকিরদের মধ্যে শুধু মজনু শাহ ও তাঁর কয়েকজন খলিফা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতেন। যুদ্ধের সময় খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ পরিবহণের জন্য উট ব্যবহার করা হতো। বিদ্রোহীদের আক্রমণের গেরিলা রণ-পদ্ধতি কোম্পানির কর্মকর্তাদের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তোলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা কোম্পানির লোকজন এবং তাদের দপ্তর ও আবাসনের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাত। সুপরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালনা ও নির্ধারিত যুদ্ধে কখনও কখনও পাঁচ থেকে ছয় হাজার ফকির-সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটত। আঠারো শতকের সত্তরের দশকে ফকির ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারে উপনীত হয়। গ্রামের সাধারণ লোকেরা বিদ্রোহীদের গুপ্তচররূপে কাজ করত এবং তারা কোম্পানির সেনাবাহিনীর গতিবিধি আগে থেকেই বিদ্রোহীদের জানিয়ে দিত।

বিদ্রোহীরা ১৭৬৩ সালে বাকেরগঞ্জে কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি আক্রমণ করে। তারা সেখানকার কুঠিয়াল মি. ক্যালীকে কয়েকদিন আটক রাখে এবং কুঠি লুণ্ঠন করে। ঐ বছর অতর্কিত আক্রমণ করে তারা ঢাকা কুঠি দখল করে নেয়। কুঠির ইংরেজ সুপারভাইজার র   ্যালফ লেস্টার পালিয়ে যান। অবশ্য পরে ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট কুঠি পুনরুদ্ধার করেন। ঐ একই বছর বিদ্রোহীরা রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় কোম্পানির কুঠি আক্রমণ করে কুঠিয়াল বেনেটকে আটক করে। বন্দি অবস্থায় বেনেটকে পাটনায় পাঠানো হলে সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়।

১৭৬৭ সালের দিকে রংপুর, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও কুমিল্লা জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহীদের তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য ১৭৬৭ সালে ক্যাপ্টেন ডি. ম্যাকেঞ্জির অধীনে রংপুরে ইংরেজ বাহিনী প্রেরিত হয়। এ সময় মালদহের ইংরেজ রেসিডেন্ট বারওয়েল কর্তৃক মার্টলের নেতৃত্বে প্রেরিত একটি ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হয় এবং সেনাপতি মার্টল নিহত হন। ম্যাকেঞ্জির বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীরা নেপালের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। ১৭৬৮ থেকে ১৭৭০ সালে প্রধানত শরণ (বিহার), বেনারস, পুর্নিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ অব্যাহত ছিল।

ফেলথামের অধীনে ইংরেজ বাহিনী ১৭৭১ সালে ঘোড়াঘাট ও রংপুরের গোবিন্দগঞ্জের পথে ফকির-সন্ন্যাসীদের উপর আক্রমণ চালায়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পালিয়ে যায়। মজনু শাহ শতাধিক আহত অনুসারী নিয়ে মহাস্থানে ফিরে যান। ১৭৭২ সালে মজনু শাহ রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়া জেলায় কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্র ও আবাসন আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এক সময় তিনি কয়েকশ' সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে রাজশাহীতে কোম্পানির রাজস্ব-অফিস কিছুকাল দখল করে রাখেন। সেখানকার সংগৃহীত সমুদয় অর্থ তাঁর হস্তগত হয়। ১৭৭৩ সালে বিদ্রোহীরা পূর্ণিয়া, বর্ধমান, কুমারখালি, যশোর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, মেদিনীপুর, বীরভূম, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও জলপাইগুড়ি এলাকায় ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করে।

১৭৭৬ সালে বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে। ১৭৭৭ থেকে ১৭৮১ সালের মধ্যে ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণ প্রধানত বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ এলাকায় পরিচালিত হয়। ১৭৮২ সালে ময়মনসিংহের আলপ্সিং পরগনার বিদ্রোহীদের তৎপরতা প্রকট আকার ধারণ করে। পুখুরিয়ায় এক তীব্র সংঘর্ষের পর মজনু শাহ তার অনুসারীদের নিয়ে মধুপুর জঙ্গলে পশ্চাদপসরণ করেন। ১৭৮৫ সালে তিনি মহাস্থানগড় অভিমুখে অগ্রসর হন এবং সেখানে এক

যুদ্ধে পরাজিত হন। পরের বছর মজনু শাহ পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে যুগপৎ আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি নিজে পূর্ববঙ্গে আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং উত্তরবঙ্গে অভিযানের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাঁর খলিফা মুসা শাহের উপর। কালেশ্বর এলাকায় লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের বাহিনীর সঙ্গে এক যুদ্ধে (৮ ডিসেম্বর ১৭৮৬) মজনু শাহের বিপুল সংখ্যক অনুসারী নিহত হন। এরপর থেকে মজনু শাহকে আর কোনো যুদ্ধ পরিচালনা করতে দেখা যায় নি। সম্ভবত কালেশ্বরের যুদ্ধে তিনি নিজে আহত হন এবং ১৭৮৮ সালের ২৬ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, পরাগল শাহ, সোবহান শাহ, মাদার বখ্‌শ, জরিশাহ, করিম শাহ, কৃপানাথ, রওশন শাহ, অনুপ নারায়ণ ও শ্রীনিবাস প্রমুখ ১৮১২ সাল পর্যন্ত ফকির-সন্ন্যাসদের বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। তবে মজনু শাহের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন ক্রমশ তার সঠিক দিকনির্দেশনা ও গতিশীলতা হারাতে থাকে। আঠারো শতকের নববইয়ের দশকের শেষদিকে বিদ্রোহ অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী দশকে বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ নেয়। [মুয়ায্‌   যম হুসায়ন খান]